Vol. 53 | No. 3 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রণেশ দাশগুপ্ত : সাহিত্য-ভাবনা ও সমালোচনা

Volume	53
Issue	3
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Munira Sultana
Published online	June 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v53i3.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v53i3.7
Pages	১১৯-১৩৬
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রণেশ দাশগুপ্ত : সাহিত্য-ভাবনা ও সমালোচনা

মুনিরা সুলতানা*

সারসংক্ষেপ : আজীবন সাম্যবাদের আদর্শে আত্মোৎসর্গীকৃত রণেশ দাশগুপ্ত বাংলাসাহিত্য-সমালোচনায়ও রেখেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তাঁর সাহিত্য-সমালোচনামূলক গ্রন্থাবলিতে সমকালীন জাতীয়-আর্ন্তজাতিক প্রগতিশীল রাজনীতি ভাবনাই কেবল নয়, প্রকাশিত হয়েছে ঐকান্তিক সাহিত্য-ভাবনা ও সমালোচনা-তত্ত্বের সুনির্দিষ্ট, ব্যতিক্রমী মতাদর্শ ও দিক-নির্দেশনা। প্রগতিশীল শিল্প-আন্দোলনের নিরবচ্ছিন্ন নেতৃত্ব ও অংশীদারিত্ব ছিল তাঁর। তবে মার্কসবাদী সমালাচক হয়েও অন্ধ তত্ত্বানুগত্য করেননি তিনি। প্রথাবিরোধী ও সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে তাঁর বস্তুনিষ্ঠ সাহিত্য-চিন্তা ও সমালোচনা ভাবনাগভীর মননশীলতায় কী করে সঞ্চারিত হয়েছে, এ প্রবন্ধে সে প্রসঙ্গটিই বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে; সেই সাথে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ কিছু সমালোচনামূলক প্রবন্ধ অনুসরণে মার্কসবাদী সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে তাঁর বিচারভঙ্গির মূল্যায়নের প্রচেষ্টাও গৃহীত হয়েছে।

রণেশ দাশগুপ্ত (১৯১২-১৯৯৭) ছিলেন অনুসরণীয় সাংবাদিক, তাত্ত্বিক-রাজনীতিক, সংগঠক, সাহিত্যবোদ্ধা ও সমালোচক। "তিনটি সত্তার সমান্তরাল ধারার সমন্বয়ে গড়ে ওঠেছিল রণেশ দাশগুপ্তের জীবন – মার্কসবাদী কর্মী, সাংবাদিক এবং সাহিত্য ও শিল্পতাত্ত্বিক।" (ভূমিকা, শাহেদ : ২০১৩) তাঁর সাহিত্য-বিবেচনার পেছনে কিংবা রসবোধের মধ্যে সক্রিয় ছিল দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শন। কিন্তু মার্কসবাদী সমালোচক হয়েও তিনি কট্টর মার্কসবাদীদের মতো ছিলেন না – তাঁর সাহিত্য-সমালোচনার বিশ্লেষণে সে কথা স্পষ্ট হবে। মার্কসীয় দর্শনে তাঁর আস্থা, এ বিষয়ক চিন্তা-চেতনার উপস্থাপনায় ও দার্শনিক দিক-নির্দেশনায় তাঁর স্বকীয়তাও তা প্রমাণ করে। কেবল রাজনীতি-অর্থনীতি নয়, জ্ঞানের নানা সূত্র কীভাবে অন্বেষণ-অনুসন্ধান করতে হয়, মার্কসবাদ থেকেই রণেশ দাশগুপ্ত সে দীক্ষা নিয়েছেন– যার মধ্যে রয়েছে সাহিত্য নন্দনতত্ত্ব-দর্শন-ইতিহাস-সমাজবিজ্ঞান-রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, ভূবিজ্ঞান এবং শিল্পকলাও।

---

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯১২-য় রণেশ দাশগুপ্তের জন্ম ও বেড়ে ওঠার সময়পর্বেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম ক্রমশ পূর্ণতা পেতে শুরু করে। স্কুল জীবনের শেষ প্রান্তে এসে 'স্বদেশী ভাবনা'য় উদ্বুদ্ধ হন তিনি। ১৯২৯-এ বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজে ছাত্রাবাসে থাকাকালীন তিনি অনুশীলন সমিতির কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বেজিত রণেশ "স্বাধীনতার প্রত্যাশায় যোগ দিয়েছিলেন বিপ্লবী দলে; সেখান থেকে যৌবনের শুরুতে মার্কসীয় দর্শনে দীক্ষা গ্রহণ।" (প্রসঙ্গকথা, শাহেদ : ২০০২) সাম্যবাদী আদর্শের রাজনীতির সাথে সারাজীবন নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছেন তিনি। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্নে ছাত্র-যুব-সাংস্কৃতিক কর্মীদের সংগঠিত করার প্রশ্নে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। ৬৯-এর গণ আন্দোলনের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর কারাবাসের সময় প্রায় ১২ বছর। কিন্তু এই বন্দিদশা তাঁর সাংগঠনিক কার্যক্রম বা সৃজনশীলতাকে রুদ্ধ করতে পারেনি। "একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন শব্দসৈনিক হিসেবে– স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্য লিখেছেন অনেক কথিকা, প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিকদের সংগঠিত করতে পালন করেছেন অগ্রণী ভূমিকা।" (ঐ, শাহেদ : ২০০২) স্বাধীনতা-পূর্ব ও উত্তর বাংলাদেশে তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও প্রগতিমুখী সংস্কৃতির ধারক হয়ে উঠেছিলেন। সাংবাদিকতার পেশাকে গ্রহণ করেছিলেন গভীরভাবে। 'গণমানুষের বলে ও বামপন্থীদের আশ্রয়স্থলের অন্যতম *সংবাদ*-এর প্রতি ছিল তাঁর অসামান্য দরদ।" (শাহেদ, ২০০২ : ৪১) কেবল তাই নয়, প্রেসক্লাবে সাংবাদিক মহলের অভিভাবক, চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সদস্য, 'খেলাঘরে'র কর্মীদের অনুপ্রেরণার উৎস, উদীচীর অন্যতম উপদেষ্টা, ঢাকার বিকাশমান নাট্য-আন্দোলনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, বাংলা একাডেমিসহ ঢাকার বহু সাহিত্য-আলোচনার মূল বক্তা– এর সবগুলো দায়িত্ব তিনি অক্লেশে সম্পাদন করেন। (শাহেদ, ২০০২ : ৪৭) এ পর্যায়ে বিস্তর লেখালেখিও করেছেন তিনি। চল্লিশের দশক থেকেই ঢাকার প্রগতি লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালনের পর থেকে জীবনের শেষ অবধি সাহিত্যসৃষ্টি ও সমালোচনা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না তিনি।

রণেশ দাশগুপ্তের সাহিত্য-চিন্তা তাঁর সমালোচনা-কর্মে স্পষ্ট হয়েছে। তাঁর সমালোচনামূলক প্রবন্ধসমূহ যেসব গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : *উপন্যাসের শিল্পরূপ (১৯৫৯), আলো দিয়ে আলো জ্বালা (১৯৭০), আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ (১৯৮৬), সাজ্জাদ জহীর প্রমুখ (১৯৮৮)।* রণেশের সমালোচনার প্রয়াস কেবল দেশজ সাহিত্যিক নিয়ে নয়, বিদেশী সাহিত্যের বিচারেও তাঁর গভীর মনস্বিতা, জ্ঞাননিষ্ঠা, পঠন-পাঠনের ব্যাপকতা এবং সর্বোপরি রসজ্ঞ চিত্তের প্রকাশ ঘটেছে।

সাহিত্যভাবনা একজন সমালোচকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই বোধ বা চিন্তাই কোনো একজন সমালোচকের বিশেষ নিরীক্ষণ ভঙ্গিকে রূপ দেয়। সাহিত্যের জন্ম বা এর রূপ সংক্রান্ত জিজ্ঞাসা সাহিত্য-বোদ্ধার প্রধান অম্বিষ্ট। পরিদৃশ্যমান জগতকে সাহিত্যকার কীভাবে নিরন্তর প্রকাশ করেন, কী করে মানবমনের এই বিশেষ প্রক্রিয়ার সহযোগে প্রকাশিত হয় উপলব্ধির প্রায় সমগ্র সংবাদ, 'সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে রণেশ দাশগুপ্ত তা ব্যাখ্যা করেন এভাবে :

> সাহিত্যকার প্রধানত শব্দশিল্পী। আর শব্দশিল্পী শিল্পী হিসেবে আমাদের মানবীয় প্রবৃত্তি, আবেগ এবং অনুভূতির কারবারী, আমাদের মানবিকতা কথাকে আশ্রয় করে মেঘ দর্শনে ময়ূরের মতো আত্মপ্রকাশ করে তাকেই বলবো সাহিত্য। (রণেশ, ২০১২ : ৩০৮)
>
> কথার লালিত্য, ব্যঞ্জনা, সংযম ও প্লাবন, স্বচ্ছতা ও গোপনীয়তা কালে কালে রক্ষকের আকুতিতে তুচ্ছ করে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। নতুন নতুন হৃদয় নিয়ে কারবার করে এসেছে এরা যুগে যুগে। নতুন নতুন ধরনের মানুষের অনুভূতির নতুন নতুন উত্তরণের সাহিত্য কায়া বদলেছে। আর একই কালে সাহিত্যের নানারূপ-হৃদয় অভিন্ন। (রণেশ, ২০১২ : ৩০৯)

সাহিত্যকে চেনাতে ও বোঝাতে যাঁরা চেষ্টা করেছেন তাঁদের প্রদত্ত সংজ্ঞার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেন রণেশ; উদ্দেশ্য সাহিত্য সম্বন্ধে এই 'জিজ্ঞাসাগুলিরও কিনারা করা'। (রণেশ, ২০১২ : ৩১১) তবে সাহিত্যকে বোঝার জন্য সর্বোপরি বিচার করার জন্য যা অনিবার্য সে ব্যাপারে সংশয়হীন বক্তব্য দিয়েছেন রণেশ, আর সেখানে তাঁর চিন্তার ব্যাপ্তি ও মতাদর্শ-মুক্ত উদার ভাবনা পরিণতি পেয়েছে। 'সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> সাহিত্যের নাড়ির বন্ধন রয়েছে অন্যান্য শিল্পকলার সঙ্গে। শুধু তাই নয়; নাড়িতে নাড়িতে বাঁধা সে সাধারণভাবে সংস্কৃতির সঙ্গে, মানবতার সঙ্গে, সমগ্র মানব-সমাজের গতি বিস্তারের সঙ্গে। সাহিত্যকে বুঝবার জন্য তাই সমগ্র মানব-সমাজের বিকাশ সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজন সংস্কৃতির জন্ম বৃদ্ধির ইতিবৃত্ত জানার। সংস্কৃতিকে জানতে গিয়ে জানতে হয়, মানবীয় প্রবৃত্তি আবেগ ও অনুভূতিকে, মানবদেহকে। জানতে হয় মনন বা চেতনার স্বরূপকে। সঙ্গে সঙ্গে এদের সবাইকে নিয়ে প্রকৃতিকে। (রণেশ, ২০১২ : ৩১১)

কিন্তু শিল্পে আধৃত চিন্তা ও ভাবগুলোকে চিন্তা-জগতের অনুরূপ ভাব ও চিন্তার প্রবহমান ধারার সঙ্গে মেলাবার এই প্রক্রিয়া সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তে পারে, সমালোচনা-কর্ম তাতে পরাস্ত হতে পারে ইতিহাসের বা সমাজ পরিবেশের কাছে, তাই রণেশের মতে, "আলোচনার মাঝখানে এদের মাত্রাধিক্য হলে সাহিত্য বিচার চাপা পড়ে সমাজতত্ত্ব ভারী হয়ে যেতে পারে।" (রণেশ, ২০১২ : ৩১১) আবার মানব সমাজ, সংস্কৃতি, মনন বা চেতনা এবং মানবদেহসমেত পরিবেশের ইতিহাসসম্মত ও পরস্পর নির্ভর গতি প্রকৃতি নির্ণয় করা না গেলে সাহিত্য জিজ্ঞাসারও কিনারা করা কঠিন হয়ে

পড়ে। কেবল ইতিবৃত্ত নয়, রণেশ দাশগুপ্ত সাময়িকতাকেও গভীর গুরুত্ব দেন, 'সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে এ ব্যাপারে মত প্রকাশ করে লিখেন :

> সাহিত্য বিচারে (নির্দিষ্ট) ফতোয়ার সন্তুষ্টি পরিহার করতেই হবে। ...কারণ নতুন সমাজের নতুন মানুষ সমগ্রভাবে জীবনকে গড়ে তুলবার জন্য এগিয়ে আসছে। (রণেশ, ২০১২ : ৩১২)

সুতরাং সাহিত্য-বিচারে যুগের রাজনৈতিক-সামাজিক মানসিক তথা সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ব্যাখ্যায় বা ইতিহাস অন্বেষণে যান্ত্রিক জড়বাদী সমাজবিজ্ঞানীর ভূমিকা তিনি নেননি। মার্কসবাদী মতাদর্শে সাহিত্য-বিচার প্রসঙ্গে 'মার্কসীয় বাতাবরণ : শতাব্দীকালের সাহিত্যে' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> মার্কস কিংবা বিশিষ্ট মার্কসবাদীদের অথবা এদের লেখা কোন বিশেষ বই বা সূত্রের উল্লেখ থাকা-না-থাকা নিয়ে কোন সাহিত্যের কাজের মূল্য যাচাই করা উচিত নয়। মার্কসের অথবা তাঁর লেখার কোন উল্লেখ থাকলে যেমন বাড়াবাড়ি করে দেখা ঠিক নয়, তেমনি না থাকলে সেই সাহিত্যের কাজ মার্কসীয় বাতাবরণের বাইরে পড়ে যায় না। (রণেশ, ২০১২ : ৩৯২)

সমালোচকের এই মনোভঙ্গি তাঁর সাহিত্য-বিচার বিশ্লেষণেও ক্রমশ স্পষ্ট হবে। সাহিত্যে গণমানুষের উপস্থিতিকে অর্থাৎ সাহিত্যের সাথে জনগণের সম্পৃক্তির বিষয়টি রণেশ দাশগুপ্ত গ্রহণ করেছিলেন গভীর তথা বৃহৎ পরিসরে বা ব্যাপক অর্থে। এটি তাঁর কাছে ছিল একাধারে সুসংবদ্ধ সাহিত্যবিধি, তত্ত্বীয় আদর্শ এবং সর্বোপরি গুরুত্বপূর্ণ নান্দনিক আকাঙ্ক্ষা। তাঁর এই প্রাতিস্বিক পর্যবেক্ষণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লালন, জীবনানন্দ দাশ প্রমুখ হয়ে ওঠেন বিপ্লবাত্মক আশাসঞ্চারী সাহিত্যকর্মের স্রষ্টা। এ পর্যায়েও যথারীতি মার্কসবাদকেই অঙ্গীকার করেন তিনি; কিন্তু মুখ্যত তিনি সাহিত্য বিচার করেছেন উদ্দিষ্ট শিল্পকর্মের স্বরূপকে সামনে রেখে। মার্কসীয় সমালোচনার গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি যে রণেশ দাশগুপ্তের সমালোচনা-দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেনি, তার স্বাক্ষর তাঁর সমালোচনাকর্মে রয়েছে। 'মার্কসবাদী দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ' ও 'মার্কসবাদীর চোখে জীবনানন্দ দাশ' এ প্রবন্ধ দুটির শিরোনামেই মার্কসীয় মতাদর্শ ধারণ করার প্রত্যয় রয়েছে; রণেশ দাশগুপ্ত একজন প্রগতিবাদী বা মার্কসীয় ভাবাদর্শে বিশ্বাসী সমালোচক হিসেবে সমালোচনার প্রারম্ভে এই মতবাদের সূত্রসমৃদ্ধ পাদটীকাও রচনা করে নিয়েছেন। মার্কসবাদী দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথকে 'সজীব ও সচল' বলেই মনে করেছেন রণেশ দাশগুপ্ত। কারণ :

> মার্কসবাদে দ্ব্যর্থহীনভাবে মৃত্যুকে অতিক্রম করার কথা আছে। মার্কসীয় দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বলতে চায়, মানবসমাজের ব্যক্তিক ও গোষ্ঠীগত সৃজনশীলতা অতীতের আবরণ ভেদ করে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সৃষ্টিশীল উপাদানগুলি রসায়িত ও জারিত হয়ে মৃত্যুকে সবসময় ডিঙ্গিয়ে চলে যাচ্ছে। কোন বিপ্লবী প্রতিভার মৃত্যু নেই। (রণেশ, ২০১২ : ৪৮৪)

রবীন্দ্রনাথকে বিচ্ছিন্ন, আনন্দময় ইতিবাদের শিল্পী, রোমান্টিক দৃষ্টি-আচ্ছন্ন, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য-পিয়াসী, শাশ্বত সত্যে অবিচল বিশ্বাসী ইত্যাদি বিশেষণে সমালোচকেরা কখনও কখনও অভিষিক্ত করেছেন। 'আধুনিকতাবাদী' শিল্প-সাহিত্য আন্দোলন বিকাশের পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত এই মূল্যায়ন বিশেষত রবীন্দ্র-বিরোধিতা একটি মুখ্য ঐতিহাসিক সত্য। মার্কসবাদীরাও শিল্পীর বিচ্ছিন্নতাকে কোনো সর্বজনীন বিষয় বলে মনে করেন না। শিল্প-সাহিত্য ব্যক্তিমানুষের সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও তাকে মার্কসীয় আলোচনায় সামাজিক চৈতন্যের অন্যতম রূপ হিসেবে দেখা হয়। রণেশ দাশগুপ্ত একজন মার্কসবাদী সমালোচক হিসেবেই রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়নে তাঁর শিল্পীসত্তাকে, কবি হিসেবে তাঁর সকল ইন্দ্রিয়জ ও অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিকে ভিন্ন মাত্রায় অনুসন্ধান করেছেন। রাবীন্দ্রিক অনেক প্রকাশকে তিনি ব্যষ্টিক না ভেবে বরং ধরে নিয়েছেন সামষ্টিক; মৃত্যু-অতিক্রান্ত পথের নিশানা হিসেবে রবীন্দ্র-শিল্পকর্মকে চিহ্নিত করে সমকালে এবং কালান্তরেও রবীন্দ্রনাথ কী করে সচল ও সজীব থাকবেন, কী করে 'স্বচ্ছন্দ হবে তার মৃত্যুহীনতা' রণেশ তা ব্যাখ্যা করে বলেছেন :

> অস্তিত্ববাদীর অধৈর্যেও ...রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি বাতিল বলে ঘোষিত হতে পারে না। যতদিন *ছিন্নপত্র* গ্রন্থের আন্তরিকতাপূর্ণ চিঠিগুলির নদীমাতৃক পরিবেশের পদ্মা আর গোরাই নদীর আশেপাশের প্রাকৃতিক জীবন অব্যাহত থাকবে, যতদিন কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ সজীব থাকবে, ততদিন রবীন্দ্রনাথকে বাংলাদেশের মানবজীবন প্রবাহ থেকে ছাঁটাই করে দেওয়া সম্ভব হবে না। ...রবীন্দ্রনাথের সজীব অনুভূতিগুলি আমাদের সংগ্রামী জীবনসত্তার বিভিন্ন উপকরণ ও উপাদানে একীভূত হয়ে রয়েছে। আমরা যে মৃত্যুকে অতিক্রম করে চলেছি, রবীন্দ্রনাথের সজীব শিল্পীসত্তা বারবার সেকথা মনে করিয়ে দেবে। আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে প্রান্তর পার হতে গিয়ে তাঁকে পাশে পাবো। (রণেশ, ২০১২ : ৪৮৫)

এছাড়া রণেশ দাশগুপ্ত স্মরণ করেছেন রবীন্দ্র-সৃষ্ট কিছু চরিত্র বা নায়ক-নায়িকাকে 'যারা মৃত্যুকে নাকচ করে জীবনের গান গাইতে থাকবে দূর ভবিষ্যতেও।' উদাহরণস্বরূপ তিনি বলেছেন রবীন্দ্রনাথের *রক্তকরবী* নাটকের বিদ্রোহী নায়ক রঞ্জন এবং *মুক্তধারা* নাটকের বিদ্রোহী নায়ক অভিজিত যারা "অপঘাতে নিহত হলেও চিরজীবী প্রকৃতির মতো মানব মুক্তিসংগ্রামে চিরজীবী। ...এই দুই গণবীর-চরিত রচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখে গিয়েছেন।" (রণেশ, ২০১২ : ৪৮৬)

রবীন্দ্রনাথের শিল্পে অন্তর্বিরোধের অভিব্যক্তি এবং ব্যঞ্জনাকেও রণেশ দাশগুপ্ত দ্বন্দ্বাত্মক ইতিহাসের ও জীবনের বস্তুসত্য এবং তা থেকে প্রগতি ও বিপ্লবের উজ্জীবনের আলোক বিচার করেছেন। 'রবীন্দ্রনাথের অন্তর্বিরোধ পরিক্রমা : খাদে নিখাদে' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

> বিশ্বব্যাপী যে প্রচণ্ড দ্বন্দ্বাত্মক বৈপ্লবিক গতিধারা নিয়ে একটা শতাব্দীকালের সকল দেশ ও মহাদেশের বহুজাতির বহুবর্ণের বহু ধর্মের সমাজ, জনগণ ও বহু ব্যক্তি আরেকটা শতাব্দী শুরু করতে যাচ্ছে, তাতে শতাব্দীকালের বিশেষ করে সেই শিল্পীদের সঙ্গে নিয়ে চলা দরকার হবে, যাঁরা বৈপ্লবিক দ্বন্দ্বাত্মকতাকে জীবনে বাস্তববাদী সাধনায় সৃষ্টিতে জ্বালানির মতো কাজে লাগিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথও এই রকমই একজন অপরিহার্য শিল্পী। আগামীতেও থাকছেন। (রণেশ, ২০১২ : ৪৮৬)

মূলত রণেশ দাশগুপ্ত উদ্দেশ্যভিত্তিক মানবীয় জীবন-দর্শন, কল্যাণকামী সমাজে পূর্ণ বিশ্বাস করেছেন এবং এ সমাজ প্রতিষ্ঠায় দেশ বা বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিত বদলাতে শিল্পী হিসেবে রবীন্দ্রনাথের যা অবদান তা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। রবীন্দ্র-সমালোচনার প্রথাগত দৃষ্টিকে বদলে দিতে সমালোচক হিসেবে তাঁর প্রত্যয়ও ঘোষণা করেছিলেন 'আলো দিয়ে আলো জ্বালা' প্রবন্ধে :

> আমরা কি রবীন্দ্রনাথের লেখার নব মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হয়ে রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি বুঝবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নিজেদের শিল্প ও জীবনগত মূল্যকেও পুরোপুরি অনুধাবন করতে চেষ্টা করব না? আমরা কি বারবার মৃত্যু ও ধ্বংসের ভ্রূকুটিকে অতিক্রম করে জীবনের তরঙ্গে তরঙ্গে উত্তরিত হব না? (রণেশ, ২০১২ : ২৪৫)

রণেশের কাছে রবীন্দ্রনাথের বিরাট সৃষ্টি-সম্ভারের দাবি এভাবে হয়ে ওঠে জীবনমুখী অর্থাৎ বৃহত্তর তথা সামষ্টিক জনজীবন-সংলগ্ন। প্রায় একই মূল্যবোধ তাঁর জীবনানন্দ দাশের শিল্পকর্মের প্রতিও রয়েছে। 'মার্কসবাদীর চোখে জীবনানন্দ দাশ' প্রবন্ধে একজন দৃঢ় মার্কসবাদী সমালোচক হিসেবে জীবনানন্দের কাব্যকীর্তির অভিনব সমালোচনা করে রণেশ দাশগুপ্ত নিজেকে মার্কসিস্ট গোঁড়ামি থেকে রক্ষা করেন। জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিতায় আত্ম-পরিক্রমা ছেড়ে ক্রমশ কি করে সমাজসচেতন হয়ে উঠলেন, দাঁড়ালেন *মহাপৃথিবীর* বিস্তৃত বুকে কিংবা *সাতটি তারার তিমিরে* সন্ধান করলেন আগামী ভোরের আলো; সমালোচক রণেশ তা নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছেন। এই সমালোচনার একটা গূঢ় ও প্রধান কারণ এই যে, তিনি জীবনানন্দের শিল্পকর্মের মধ্য থেকে 'উদ্দেশ্যহীনতা ও উত্তরণহীনতার প্রাধান্যের' পরিবর্তে অন্বেষণ করতে চেয়েছেন 'জীবনের অগ্রসর উদ্দেশ্য ও উত্তরণের অনিবার্যতা।' (রণেশ, ২০১২ : ৫১৪) এছাড়াও জীবনানন্দ সম্পর্কে মার্কসবাদ বিরোধীদের প্রচারিত 'সংশয়ের ধোঁয়া' (রণেশ, ২০১২ : ৫১৫) কাটাতেও তিনি তাঁকে বিচারের তাগিদ অনুভব করেছেন। কারণ, "এরাই প্রচার করে এসেছে, কবির কোন অগ্রসর উদ্দেশ্য ছিলনা, তিনি বিপ্লবের প্রয়োজনবোধের বিপরীত জগতে বাস করতেন। এই ধোঁয়া থেকে জীবনানন্দ দাশকে বের করে আনতে হবে তাঁকে মার্কসীয় দৃষ্টিতে ইতিবাচক কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য।" (রণেশ, ২০১২ : ৫১৫)

সংশয়-সংকুল আধুনিক যুগের কবি হিসেবে জীবনানন্দের পথ ছিল ভিন্ন এবং তাঁর দ্বন্দ্ব বহির্জগৎ অন্তর্জগৎ ব্যাপ্ত করে। (দীপ্তি, ১৯৯৭ : ১১৭) জীবনানন্দ সম্পর্কে এরকম মূল্যায়ন আরো অনেক সমালোচকেরই রয়েছে। রণেশ দাশগুপ্ত মনে করেন যে, জীবনানন্দের কিছু কবিতা পড়ে মন শক্তি হারায় কিন্তু বিপরীতে অনেক কবিতাই সমস্ত নৈরাশ্য কাটিয়ে দেয়। উদাহরণস্বরূপ তিনি কিছু কবিতার উল্লেখ করেছেন, যেমন : 'অন্ধকার থেকে', 'একটি কবিতা', 'যতদিন পৃথিবীতে' (*বেলা অবেলা কালবেলা*), 'কবিতা', 'উত্তরপ্রদেশ' 'মিতভাষণ' (*সাতটি তারার তিমির*), 'পৃথিবীলোক' (*মহাপৃথিবী*)। রণেশের মতে, জীবনানন্দ দাশ নিজেকে আত্মকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্ন মানব বলে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করেছেন বলে একটি ধারণার সৃষ্টি হয়ে রয়েছে এবং সে ধারণাকে মার্কসবাদের বিরোধীরা কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছে এবং ভবিষ্যতেও চেষ্টা করবে। সমালোচক এ প্রসঙ্গে জীবননান্দ দাশের কিছু কবিতার পঙ্ক্তি তুলে ধরেছেন, যেমন 'পৃথিবীতে' কবিতা থেকে :

শস্যের ভিতরে রৌদ্রে পৃথিবীর সকাল বেলায়
কোনো এক কবি বসে আছে ;
অথবা সে কারাগারে ক্যাম্পে অন্ধকারে ;
তবুও সে প্রীত অবহিত হয়ে আছে
এই পৃথিবীর রোদে– এখানে রাত্রির গন্ধে নক্ষত্রের তরে
তাই সে এখানকার ক্লান্ত মানবীয় পরিবেশ
সুস্থ করে নিতে চায় পরিচ্ছন্ন মানুষের মতো,
সমভবিতব্যতার অন্ধকারে দেশ।
মিশে গেলে, জীবনকে সকলের তরে ভাল ক'রে
পেতে হলে এই অবসন্ন ম্লান পৃথিবীর মতো
অম্লান, অক্লান্ত হয়ে বেঁচে থাকা চাই।
একদিন স্বর্গে যেতে হতো। (উদ্ধৃত, রণেশ, ২০১২ : ৫১৬)

'ব্যক্তির ক্ষয়রোধও মানবকে যে ক্ষয়ের মধ্যে ফেলে দিতে পারে না সে সম্বন্ধে দিয়েছেন তিনি সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি।' রণেশের মতে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিই এর প্রমাণ :

যতদিন পৃথিবীতে জীবন রয়েছে
দুই চোখ মেলে রেখে স্থির
মৃত্যু আর ব্যঞ্জনার কুয়াশার পারে
সত্য সেবা শান্তি মুক্তির
নির্দেশের পথ ধরে চলে

হয়তো বা ক্রমে আরো আলো
পাওয়া যাবে বাহিরে-হৃদয়ে,
মানব ক্ষয়িত হয় না– জাতির ব্যক্তির ক্ষয়ে ।
ইতিহাসে ঢের দিন প্রমাণ করেছে ।
(রণেশ, ২০১২ : ৫১৬)

তবে মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনানন্দ দাশকে দেখলে "তাঁর মধ্যে যে দ্বন্দ্বও রয়েছে সেটাকে স্বাভাবিক বলেই মনে হবে, কারণ, জীবনানন্দ দাশও তো একটা ক্রান্তিকালের ইতিহাসের নানা ধারায় প্রসারিত বৈচিত্র্যের একটি বিশেষ সৃষ্টি, যার মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, যদিও আক্ষেপ নেই । সংশয় রয়েছে? আমরা বলবো যাচাই করে নেওয়ার কঠোরতা রয়েছে ।" (রণেশ, ২০১২ : ৫১৯) জীবনানন্দের কাব্য মানবীয় পরিমণ্ডল ও কোন আত্মনিবদ্ধ কবির ভাবপ্রক্ষেপণের ছায়া নয়; রণেশ দাশগুপ্তের মতে, 'সে হলো ইতিহাসের বিকাশমান মানবসমাজ ।' (রণেশ, ২০১২ : ৫২৩) যদিও জীবনানন্দের কবিতায় সমালোচক শ্রেণী-সংগ্রামের ইতিহাস পাননি, কারণ কবি তা রচনাও করেননি, তবে "মানুষের ইতিহাসকে তিনি দ্বন্দ্বাত্মক অগ্রগতিধারার ছাঁচে ঢেলেই প্রবাহিত করে দেখেছেন ।" (রণেশ, ২০১২ : ৫২৫) অর্থাৎ তাঁর কবিতার পরিবেশ এবং একই সাথে সমকাল থেকে ব্যক্তি ও সমষ্টিমানস নির্বাসিত নয়, বরং সেখানে ব্যষ্টি ও সমষ্টিচেতনার সামাজিকীকরণ উপলব্ধি করা যায় । এমনকি জীবনানন্দ দাশের "প্রকৃতি নিবদ্ধতা বিকিরণের মানবিকতায় উৎসাহিত হয়েছে ।" (রণেশ, ২০১২ : ৫২৪) তিনি 'বিচ্ছিন্নতা ও অমানবিকতার প্রচারণাকে রূঢ় আঘাত' করেছেন বলেই *রূপসী বাংলা* জনমানুষের বাংলা হয়ে ওঠে । রণেশ লিখেছেন :

> এই রূপসী বাংলা শুধু বাঁকা চাঁদ, শূন্য মাঠ, শিশিরের ঘ্রাণের বাংলা নয় । এ বাংলা ছোট ছোট ঘরের বাংলা, মানবমানবীর বাংলা । দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাংলা, যেখানে ঝড় আসে । কিশোরীদের নিয়ে রচিত গীতিকবিতার বাংলা । সেই নারীদের বাংলা, যাদের হাত চাল ধুতে ধুতে শিঠে শাদা হয়ে গেছে । এখানে স্বাধীনতারও ডানার ঝাপটা । (রণেশ, ২০১২ : ৫২৪)

রণেশের মতে, জীবনানন্দ দাশ মার্কসবাদী হিসেবে তাঁর কবিতা লেখেননি, সমাজবিপ্লবের চাবিকাঠি হিসেবে শ্রেণি সংগ্রামকে তিনি বোঝেনওনি, দেখতেও পাননি । "কিন্তু মার্কসবাদীরা জীবনানন্দ দাশের কবিতাকে সমাজবিপ্লবের অন্যতম উপকরণ হিসেবেই গ্রহণ করবে । কারণ তাঁর কবিতার মধ্যে রয়েছে লোভ ও নীচতাকে অতিক্রম করে মানুষের এগিয়ে চলার তাগিদ । মার্কসবাদীরা যে নতুন জগৎ গড়ে তুলতে চাইছে তার অঙ্গীকার জীবনানন্দ দাশের কবিতায় উপস্থিত ।" (রণেশ, ২০১২ : ৫২৫)

এই উত্তরণের মার্কসীয় সাধনায় মিশে আছে জীবন ও বুদ্ধির দ্বৈত সাধনা, শিল্পী তাকে যেভাবেই রূপ দেন না কেন, জীবনের প্রত্যক্ষের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলে, বহির্জগত বা বস্তু সম্পর্কে মনোভাব স্পষ্ট হলে, লোকজীবন ও লোক মানস-সম্পৃক্ত হলে তাকেই সমালোচক রণেশ দাশগুপ্ত জনসমাজের চৈতন্যের সাথে সম্পৃক্ত শিল্পকর্ম হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন; এ কারণে তাঁর সমালোচনা যান্ত্রিক মার্কসবাদী হয়ে ওঠেনি। সামাজিক বাস্তবতা এবং শিল্পীর স্বাধীনতার সমন্বয় ও পুনর্বিন্যাসের গুরুত্ব ছিল তাঁর কাছে, শিল্প-সাহিত্যে মানবিক উপকরণ থাকাটা খুবই জরুরি মনে করেছেন তিনি। কেবল আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্তির শ্রেণি সংগ্রাম নয়, সাহিত্যে রণেশ দাশগুপ্ত মানুষের জৈবিকতা, তার অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রতিষ্ঠার সার্বিক সংগ্রামশীলতাও অন্বেষণ করেছেন। এ কারণেই তাঁর কাছে জনগণ-লোকজীবনের ধারণার ব্যাপ্তি অনেক গভীর; জীবনের বহুবাচনিক পরিসর তাঁর কাছে মার্কসীয় দৃষ্টিতে কেবল আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণের বিষয়বস্তু নয়; সাহিত্য সৃষ্টির বৃহত্তম পটে এবং কেবল শিল্প-সাহিত্য জন্মের নিয়ত প্রসারণশীল অভিজ্ঞতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে একে বিবেচনা করেছেন তিনি। বিশ্বজনীন এই বোধ থেকেই রণেশ দাশগুপ্ত নিরন্তর অন্বেষণ করেছেন সৃজনশীল শিল্পী ও জনগণমনের অন্বয়; আর একেই তিনি বলতে চেয়েছেন বিপ্লব। সে কারণে লালন তাঁর কাছে হয়ে ওঠেন 'শাশ্বত ও বৈপ্লবিক।' লালনের বিপ্লবী প্রয়াস তাঁর কাছে সহজিয়া — কারণ এতে রয়েছে ব্যাপকভাবে জনবোধ এবং তাঁর লড়াই আত্মিক মানবিক আবেদন-সমন্বিত। 'লালন : শাশ্বত ও বৈপ্লবিক' প্রবন্ধে রণেশ লিখেছেন—

> ...বাউল ও লোকসংগীতের শাশ্বত মানবিক আবেদনের সঙ্গে সঙ্গে একটা বৈপ্লবিক দিকও সামনে এসেছে। আবহমান বাংলার বাউল ও লোকসঙ্গীতের ধারায় লালনগীতি ঋতুরঙ্গ কিংবা নদীমালার মতো প্রবাহিত হয়ে উৎসবে ও বিপর্যয়ে জনগণমনে আনন্দ ও আশ্বাস এবং সেই সঙ্গে একটা নিগূঢ় মানবিক বিশ্বদর্শন জুগিয়ে আসছে। (রণেশ, ২০১৪ : ২৪৫)

রবীন্দ্র-লালন মতাদর্শের সংযাগ-সম্পৃক্তিও রণেশ এই দৃষ্টিতেই অনুসন্ধান করেছেন। যৌবনের শুরু থেকেই এবং শেষ বয়স পর্যন্ত লালনের গান ও দর্শনকে রবীন্দ্রনাথ মর্যাদা দিয়েছেন, শিল্প-চেতনায় ধারণ করেছেন; এ ব্যাপারটিকে সমালোচক 'আজকের শিল্পরূপ চিন্তার একটা বিপ্লবী সূত্রস্বরূপ' (রণেশ, ২০১৪ : ২৪৭) বলে বিবেচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথে লালনের প্রভাব বিষয়ে রণেশ লিখেছেন :

> (লালনের) এই সহজিয়া ধরনের মুক্তিসংগ্রামটি, বিপ্লব ব্যাপারটি রবীন্দ্রনাথের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনা ও সৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্রনাথের শেষ লেখাগুলিতে যখন তিনি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশ্বপরিচয় লিখেছেন, তখনও এই সহজিয়া বিপ্লবী মানবিক মুক্তিধারা বড় জায়গা নিয়ে রয়েছে। (রণেশ, ২০১৪ : ২৪৭)।

সাহিত্যিকের লোকায়ত ভাবনাচিন্তা ও সাহিত্যরূপসৃষ্টির ক্ষেত্র বিচারে সমালোচক রণেশ দাশগুপ্তের অন্বেষণ এককেন্দ্রিক নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখের মূল্যায়নে রণেশ দাশগুপ্তের মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে আপাত অর্থে আরোপিত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু দায়বদ্ধ সমালোচক হিসেবে; তাঁর যৌক্তিক শৃঙ্খলাপূর্ণ পর্যালোচনায়, নান্দনিকতা ও শিল্পদর্শন-চেতনার প্রকাশ যেভাবে ঘটেছে তাতে রণেশ-পাঠকের এ বিভ্রান্তি অক্রিয় হয়ে যায়।

সাহিত্যকর্মের স্বরূপকে সামনে রেখে এর নানামাত্রিক বিশ্লেষণ করেছেন রণেশ দাশগুপ্ত। লেখকের অভিজ্ঞতা কতটা সামাজিক; শিল্পপাঠে এটা ছিল সমালোচক রণেশের নান্দনিক সংবেদ। উর্দু লেখক সাজ্জাদ জহীর (১৯০৫-১৯৭৩) ও মখদুম মহিউদ্দিন (১৯০৮-১৯৬৯), সত্যেন সেন (১৯০৭-১৯৮১), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০৮-১৯৫৬), সোমেন চন্দ (১৯২০-১৯৪২), মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১), সুকান্ত ভট্টাচার্য (১৯২৬-১৯৪৭), শহীদুল্লাহ কায়সার (১৯২৭-১৯৭১) প্রমুখের সাহিত্যকর্মের বিচার করেছেন তিনি। লেখকদের মধ্যে যাঁরা কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন, সাহিত্য-সৃষ্টিতে তাঁদের বিশ্বাসকৃত মতবাদ কতটা এবং কী উপায়ে প্রতিফলিত হয়েছে; লেখকের সমাজ ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করে এর বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা করেছেন রণেশ। পুঁজিবাদী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ এবং তার চূড়ান্ত রূপ ফ্যাসিবাদের শোষণ থেকে মুক্তির প্রয়োজনে জনগণের শ্রেণি সংগঠনগুলোর ঐক্য এবং সুসংগঠিত জনচেতনা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। রণেশের মতে এই "প্রয়োজনে সহায়তা করার দায়িত্ব বর্তেছিল প্রগতিমনা লেখক-লেখিকাদের উপর। সুতরাং তিরিশের দশকে লেখক-লেখিকারা যে প্রগতি লেখক সংঘের লক্ষ্য ও আদর্শ নির্দিষ্ট করেন, তাতে এসেছিল স্বদেশ ও নিজ অঞ্চলের জনগণের জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের গভীর সংযোগ স্থাপনের তাগিদ। প্রগতি লেখক সংঘের লেখক-লেখিকারা এই ভাবে বাংলা গণমুখী সাহিত্যের ধারা পত্তন করেন। কর্মী এবং লেখক-লেখিকাদের মধ্যে যে ব্যবধানের রেখা ছিল ইতঃপূর্বে সেটাকে দূর করার চেষ্টাও শুরু হয়।" (রণেশ, ২০১২ : ৫৪৩) আর লেখক বা তার সাহিত্যকর্মের এই অনিবার্য দায়বদ্ধতাটি কেবল কম্যুনিস্ট আদর্শের সাথেই জড়িত নয়, রণেশ একে সাহিত্য সৃজনের সহজাত প্রক্রিয়া হিসেবে গ্রহণ করে এক বিরাট মুক্তির শিল্পতত্ত্ব নির্মাণ করতে চান; তিনি মনে করেন :

> সাহিত্য আশা আকাঙ্ক্ষাকে ও প্রচলিতের ভাঙ্গাগড়ার অগ্রগতিধারাকে শুধুমাত্র প্রতিফলিত করেই ক্ষান্ত থাকতে পারে না, তাকে মুক্তি ও আবেগকে সমন্বিত করে মূল্যবোধকে প্রসারিত ও সমৃদ্ধ এবং দুরূহ বৈপ্লবিক গতিধারাকেও শরিক করে তোলার কাজটুকু করতে হয়..... । (রণেশ, ২০১২ : ৫৪০)

এই সূত্রেই কম্যুনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসী শিল্প-সাহিত্যিকের বিচার করেন রণেশ। বিশ ও তিরিশের দশকের বাংলা সাহিত্যের গণমানবিকতা হয়েছিল ভিন্নতর। বিশের দশকে যা অভিহিত হয়েছিল আধুনিক বলে, তিরিশের দশকে তার উত্তরণ হয়েছিল প্রগতিতে। এই উত্তরণের প্রধান পার্থক্য রেখাটি 'সোমেন চন্দের পরিচিতি ও পটভূমি' প্রবন্ধে রণেশ পরিস্ফুট করেন এভাবে :

> 'আধুনিকতার' উদ্ভবের মূলে রাজনৈতিক বিপ্লবী অভ্যুত্থান থাকলেও তা সমস্ত আধুনিকতায় প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। নরনারীর বিদ্রোহ স্থান পেয়েছিল প্রধানত দেহাত্মিকভাবে। প্রগতির উদ্ভবের মূলে যে রাজনৈতিক বিপ্লবের আয়োজনটি ছিল তা প্রগতির মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, নরনারীর বিদ্রোহ ছিল দেহাত্মিকতার সঙ্গে সামাজিক রাষ্ট্রিক। (রণেশ, ২০১২ : ৫৪৯)

অর্থাৎ প্রগতির মধ্যেই ছিল আধুনিকের দ্বন্দ্ব-ঐকাত্মিক বিন্যাস। এ কারণে বাংলা সাহিত্যে বিশ ও তিরিশের দশকে জনগণাত্মক শিল্পসৃষ্টির শৈলী বা বিষয়বস্তুতে পাওয়া যেতে পারে উপকরণের মিশ্রণ। রণেশের মতে, "এই মিশ্রণ থেকে প্রগতির একটা পরিষ্কার গুণগত পার্থক্য নিয়ে বেরিয়ে আসার জন্য প্রগতির সচেতন কারিগররা চেষ্টা করেন।" (রণেশ, ২০১২ : ৫৪৯) আর তাদের এই চেষ্টা রাজনৈতিক ও শিল্পশৈলীগত উপকরণ ও বিষয়বস্তু উভয় দিক থেকেই। উক্ত দশকগুলোর সৃজনশীল লেখকদেরকে রণেশ দাশগুপ্ত বিচার করে তা প্রমাণও করেন। যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় চল্লিশের এবং পঞ্চাশের দশকে প্রগতির ধারাকে যে গুণগত পার্থক্যে উন্নীত করেছেন; রণেশের মতে তার সূচনা হয়েছিল সোমেন চন্দের লেখায়। সোমেন সাধারণ ও সাদামাটা মানুষের অন্তরাত্মার খোঁজ নিতে গিয়ে মানুষের আত্মজৈবিক অথবা জৈব-আত্মিক যে উপাদানগুলির খোঁজ পেয়েছিলেন, "সেগুলিই সংগ্রামী চরিত্রে নতুনভাবে দ্বন্দ্বাত্মক গতিধারায় বিন্যস্ত এবং এইভাবে নবগুণে উত্তরিত হয়, এরকম একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন বলেই সম্ভবত তিনি শ্রমিক ইউনিয়ন কিংবা স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে যে গল্প লিখেছেন, তাতে বিপ্লবী চরিত্রগুলি রক্ত মাংসে তৈরি গোটা গোটা মানুষ।" (রণেশ, ২০১২ : ৫৫১)

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে নিম্নমধ্যবিত্ত বা নিম্নবর্গের মানুষগুলোকে, তাদের সাধারণ রক্তমাংসের জীবনকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তা করতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানের চেতন-অবচেতনের সূত্রগুলো এই শ্রেণির মানুষের চিন্তায় ও কর্মের প্রকাশের চাবিকাঠি হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন তিনি। রণেশ মনে করেন, সামান্য এই সব মানুষের কথা বলতে গিয়েই তাঁর 'গদ্য মহাকাব্যিক উপন্যাস হয়ে উঠেছে।' (রণেশ, ২০১২ : ৫২৭) তাঁর লেখার পরিধিতে যেসব নর-নারীর চরিত্র আছে, তাদের প্রত্যেকের মুক্ত সত্তাটিকে বোঝার চেষ্টা করেছেন তিনি, তাই জৈবিক আকাঙ্ক্ষার ব্যাপারটি বাস্তবিকভাবেই এসেছে; 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রবন্ধে রণেশ লিখেছেন :

> এই মুক্ত সত্তাই বাস্তবজীবনে এবং বিপ্লবের সংগ্রামের উন্মোচনে জৈবিকতায় আবদ্ধ থাকাকে ইচ্ছা নাম দিয়ে আটকে রাখতে পারেনি। বিপ্লবের কাছ থেকে সে পেয়েছে বিপুলতার ইচ্ছা। ... আর সংগ্রাম ও বিপ্লবের কথা ছাড়া অন্য কিছু যখন মানিক বলতে চাননি, তখন তাঁর কট্টর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, সেটাও তিনি এনেছেন বিপ্লবের বিপুলতাকে দেখাবার জন্য। (রণেশ, ২০১২ : ৫৩১)

কিন্তু কমিউনিস্ট হলেও সংঘচেতনা ও রাজনীতিবোধকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিরেট শিল্প-প্রোপাগান্ডায় পরিণত করেননি। রণেশের মতে, *পদ্মানদীর মাঝি*, *পুতুলনাচের ইতিকথা* এবং *দিবারাত্রির কাব্য*র লেখক "রাজনীতি বর্জিত কোনাদিনই ছিলেন না। প্রথমদিকে তাঁর মনে রাজনীতি ছিল অন্তঃশীল। ... কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হবার পরে তাঁর লেখায় বস্তু-সত্য বাড়লো।" (রণেশ, ২০১২ : ৫৩২-৫৩৩)। তাঁর উপন্যাসের ভাষাও এ কারণে 'জনগণাত্মক' হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসের শিল্পরূপ বিষয়ে রণেশ দাশগুপ্তের রূপচিন্তা তথা তাত্ত্বিক উপলব্ধি সম্পর্কে সমালোচক-মত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। রণেশের উপন্যাসের রূপচিন্তাকে কয়েকটি সূত্রে বিধিবদ্ধ করে সমালোচক লিখেছেন :

> উপন্যাসের উপাদান গৃহীত হয় লোকবাস্তবজীবন পটে বিচরণরত বহু নরনারীর অভিজ্ঞতা ও মনোপ্রবাহের দোলাচল-ক্ষেত্র থেকে। বহুস্তরের দ্বারা বহুলাঙ্গবিশিষ্টতা-প্রাপ্ত অবয়ব ও জীবনের রঙ্গরস উপন্যাসের প্রাণশক্তি। ট্রাজেডির একাধিপত্য ও নায়ক-মহিমার অনড় রূপ ভেঙে দিয়ে উপন্যাস হবে বিবিধ স্বর-সাপেক্ষতা, ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার বিবর্ধিত জীবনধারা; নায়কত্ব নয়, চরিত্র-বিনির্মাণই উপন্যাসের লক্ষ্য।
>
> লোকভাষা, চরিত্রবৈচিত্র্য এবং পরিবেষ্টনীভিত্তিক বাস্তবপটই উপন্যাসের মূল উপাদান। দেশকাল ভেদে তা যে-কোন রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। এতে যুক্ত হতে পারে সমাজ সভ্যতার সর্পিল গতি ও তত্ত্বের নব-নব উদ্‌ঘাটন-প্রভাবিত পরিবর্তন।
>
> উপাদানসমূহ ও রূপায়ণ-ক্রিয়া বিন্দুবদ্ধ হবে ব্যক্তিমানুষের নির্মাণে – যে ব্যক্তিমানুষ দাঁড়িয়ে আছে সময়-সমাজ-ইতিহাসের জটিল প্রান্তে; প্রশ্নবিদ্ধ, অভিজ্ঞতাঋদ্ধ ও বহুজন সংস্পর্শে ক্রমরূপান্তরিত ব্যক্তিমানুষই উপন্যাসের আধেয়। এই বিন্দুবদ্ধ মানুষকে অঙ্কনের ক্ষেত্রে থাকবে ঔপন্যাসিকের চেতনালোকের গভীরতা, প্রজ্ঞার আলোয় জীবনকে চিনে নেওয়ার অভীপ্সা। ঔপন্যাসিকের জীবনবোধ-উত্থিত সচেতন চৈতন্যলোকই উপন্যাসের শিল্পরূপের অনুঘটক (catalyst)। বিশ্ব-উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ও রূপের প্রকাশ বিচিত্র হলেও মূলধারা হচ্ছে চৈতন্যলোক। (আকতার, ২০০২ : ২৪৮)

রণেশ দাশগুপ্তের উপন্যাস বিচার সর্বোপরি সাহিত্য-বিচারের ধরন সম্পর্কে সমালোচক লিখেছেন :

> *উপন্যাসের শিল্পরূপ* আমাদের নিশ্চিতভাবে রণেশদার মার্কসবাদী চিন্তার ধরনটা বুঝিয়ে দিয়েছিল। বস্তুবাদী বিচারের নামে আমাদের এখানে এবং পশ্চিমবঙ্গেও অনেক যান্ত্রিক সমালোচনার প্রচলন ছিল। *উপন্যাসের শিল্পরূপ* পড়লে বোঝা যায় যে, এর লেখক সবরকম যান্ত্রিকতার বিরোধী ছিলেন, সমাজসংলগ্ন হয়েও সাহিত্যের যে একটা স্বায়ত্তশাসন আছে– তার নিজস্ব গতিপথ এবং রীতিনীতি আছে, জীবনকে দেখার ও দেখাবার যে আলাদা ধরন আছে– সেটায় তাঁর আস্থা ছিল। (আনিসুজ্জামান, ২০০২ : ৬৫)

উপন্যাস সমালোচনায় সমাজ ও মানুষের পরিবেশ পরিস্থিতির বিন্যাস তুলে ধরেছেন রণেশ দাশগুপ্ত। বাংলাদেশের সাহিত্যে সমাজভিত্তির দর্শন প্রতিষ্ঠায় তাঁর অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। এজন্য শুধু এদেশের লেখক নয়, তাবৎ বিশ্বের লেখকদের চেতনাকে একীভূত করেছেন এবং যুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এমনটাই তার মননবৈশিষ্ট্য। জীবনের প্রতি শিল্পীর আনুগত্য বা শিল্পে জীবনের জয়গানই গভীরভাবে অনুসন্ধান করেছেন তিনি। তাঁর জীবনবোধ বা জীবন-জগৎ দৃষ্টিতে বর্হিবাস্তবতা বাস্তবতা-তত্ত্বের মোড়কে অতিক্রান্ত রূপ পায়। জীবনের দৈনন্দিন উপকরণের সঙ্গে কল্পনা-নিষিক্ত নিরন্তর নৈর্ব্যক্তিক এক বাস্তবতার সাথেই লেখক সহাবস্থান করেন। এটা সর্বতোভাবে জীবনেরই অঙ্গ, যা অজ্ঞেয় নয়, অপ্রাপ্য নয়, অনাস্বাদিত নয়, বাস্তবের এই দ্বিবাচনিক অভিব্যক্তিতেই লেখকের বসবাস। রণেশ দাশগুপ্ত সাহিত্যকর্মের বিচারে বসে সাহিত্য-স্রষ্টার সেই বিহারে-বিচরণে অংশ নেন। সেই সাথে দুই বাস্তবের পার্থক্য এবং সমান্তরলতা কীভাবে ব্যক্ত হচ্ছে, তার নিবিড় পাঠও উপস্থাপন করেন। শিল্পকলাকে আবেগপ্রবণ আখ্যা দিয়ে রণেশ লিখেছেন, "বিশ্ব প্রকৃতির যে নানা উপাদান মানুষের কামনা বাসনার স্বাক্ষর গ্রহণ করে জীবনের ভঙ্গিমাকে ব্যঞ্জনা দেয় তারাই তো শিল্পকলার উপাদান। অবশ্য এদের উৎস হচ্ছে অর্থনৈতিক সমাজ ও জীবিকা। মনন রয়েছে এদের সাথে জড়িয়ে। শিল্পকলা তাই মননকে বাদ দিতে পারেনি একেবারে।" (রণেশ, ২০১২ : ৩১৪) তাছাড়া "অর্থনৈতিক সমাজ, আবেগ এবং চেতনা যেহেতু পরস্পরকে দিয়ে নিয়ে আঘাতে সংঘাতে ক্ষতি বৃদ্ধিতে এগিয়ে চলে আসছে, সেজন্য এটা সহজেই বোধগম্য যে চেতনা যদি কনিষ্ঠতর, সে সমৃদ্ধ হলে যেমন একদিকে অর্থনৈতিক জীবন উন্নত হবে, তেমনি আবেগভিত্তিক শিল্পকলাও প্রসার লাভ করবে। প্রকৃতির সত্য তথা বিজ্ঞানও অগ্রসর হবে। কাজেই শ্রেণিশাসিত সমাজের বিবর্তনে মানবীয় মূল্য না কমে বরং বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে।" (রণেশ, ২০১২ : ৩১৯) সুতরাং সাহিত্যে এই মানবীয় মূল্যই হল সর্বাধিক।

শিল্পকলা আর বৈপ্লবিক রাজনীতির গভীর সম্পর্ক ও এর অনিবার্যতা প্রসঙ্গে তিনি বিচার করেছেন নাট্যকার মুনীর চৌধুরী ও কাজী নজরুল ইসলামকে। 'সাহিত্য আর প্রগতিশীল কাজ যে পরস্পরের পরম মিত্র হতে পারে সে কথা' (রণেশ, ২০১২ : ৫৫১) মুনীর চৌধুরীর নাটক সমালোচনায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন তিনি। নজরুল

সমালোচনায়ও সংকীর্ণতাবিহীন ভিন্নধর্মী বক্তব্য দিয়েছেন রণেশ। 'নজরুল কাব্যপ্রবাহের জঙ্গমবিচার' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> নজরুল কাব্যকে আমাদের আধুনিক বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত নদী-চেতনার মতোই শিল্পরূপ-চেতনায় উদ্ভাসিত করে দেখছি, তাতে রয়েছে প্রাণের তাগিদ, সাগরমুখীতার তাগিদ, ইতিহাসের অগ্রগতির তাগিদ।
>
> ... তাঁর প্রতিটি গান, প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ একটি গতিশীল অদৃশ্য তরল সূত্রে গ্রথিত। এই গতিশীল সূত্রকে কবি তুলে নিয়েছিলেন তাঁর সমসাময়িক কাল-তরঙ্গ থেকে এবং সমর্পণ করে গিয়েছিলেন ভবিষ্যতের গর্ভে সমগ্র জীবনের মূলসূত্র হিসাবে।
>
> ... এ হচ্ছে বিশ্ব সমাজবাদী ঊষাকালের চারণ কবি; এ কবি ধূমকেতু আর ফণীমনসা, অগ্নিবীণা আর বিষের বাঁশীর কবি, এই কারণে যে, যে চিরবঞ্চিত সর্বহারাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার বাণী নজরুলের কাব্যে বিস্ফোরিত হয়ে বেরিয়ে এল, তারা কল্লোল যুগের অন্যতম নিষ্ঠাবান গল্প লেখকের ভাষায় ছিল 'রূপের বাহিরে'। (রণেশ, ২০১২ : ২৪৮-২৪৯-২৫১)

টি. এস. এলিয়টকে নয়, আধুনিক বাংলা কবিতার পথপ্রদর্শক হিসেবে রণেশ কাজী নজরুল ইসলামকে স্বীকৃতি দেন এবং বলেন 'নিজের শিল্পীসত্তাকে (নজরুল) উজাড় করে দিয়েছেন যেকোন মানব-মুক্তির প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে।' (রণেশ, ২০১২ : ২৫৪-২৫৫)

বিদেশী বহু সাহিত্যিকের সমালোচনাকালে সাহিত্যে বিশেষত কথাসাহিত্যের বিচারকালে রণেশ বিশ্লেষণ করেছেন যে তা মানবচরিত্র এবং তার বহিরাশ্রয়কে কতটা গভীরভাবে ধারণ করেছে। উপন্যাসে সামাজিক ও ব্যক্তিক জীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার মহাকাব্যিক বাস্তববাদী পদ্ধতি প্রয়োগকে তিনি স্বাগত জানান। উপন্যাস-তাত্ত্বিক গিয়র্গি লুকাচ (১৮৮৫-১৯৭১), ফরাসি ঔপন্যাসিক বালজাঁক (১৭৯৯-১৮৫০), গুস্তাভ ফ্লবেয়র (১৮২১-১৮৮০) গী দে মোঁপাসা (১৮৫০-১৮৯৩), রোমাঁ রোলাঁ (১৮৬৬-১৯৪৪), আঁরি বারবুসে (১৮৭৩-১৯৩৫), লুই আরাগঁ (১৮৯৭-১৯৮২), আন্দ্রে মার্লো (১৯০১-১৯৭৬), জ্যাঁ পল সার্ত্রে (১৯০৫-১৯৮০), আলবেয়ার কামু (১৯১৩-১৯৬০), অ্যালাঁ রবগ্রীয়ে (১৯২২-), চীনা ঔপন্যাসিক লু সুন (১৮৮১-১৯৩৬), টিং লিং (১৯০৪-১৯৮৬), কলম্বিয়ান কথাসাহিত্যিক গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ (১৯২৭-২০১৪), রুশ ঔপন্যাসিক টলস্টয় (১৮২৮-১৯১০), ম্যাক্সিম গোর্কি (১৮৬৮-১৯৩৬), লিওনিদ লিওনভ (১৮৯৯-১৯৯৪), মিখাইল শলোকভ (১৯০৫-১৯৮৪) প্রমুখ এবং বিশ্বের আরো অনেক ঔপন্যাসিক আলোচিত হয়েছেন রণেশের লেখায়। বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিতে সমাজ-বিপ্লবের সদা অগ্রসর ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে উপন্যাসের স্থান নির্ণয় করেছেন তিনি। কিন্তু আসলে উপন্যাস তথা সাহিত্য গণজীবন-তরঙ্গিত কিনা, অথবা তা জীবন্তভাবে প্রকাশিত

হয়েছে কিনা, দ্বিতীয়ত সামাজিক জীবন-প্রবাহের ভিতর থেকে উপন্যাস কত রকমভাবে বেরিয়ে এসেছে; সর্বোপরি শুষ্ক ইতিহাস অনুসন্ধান না করে "নবসমাজের ছায়ায় সামাজিক, ব্যক্তিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক বিকাশ-সম্ভাবনাকে" (রণেশ, ২০১২ : ২১৯) বিচার করাই রণেশের মতে মূলত উপন্যাস বিচার। তিনি মনে করেন "উপন্যাস যত গভীরে যেতে পারে ইতিহাস কিংবা অন্য কোন খতিয়ান ততটা পারে না।" (রণেশ, ২০১৪ : ৩১২) উপন্যাস তাঁর কাছে একাধারে ইতিহাস নয়, সমাজতান্ত্রিক সন্দর্ভও নয়। বরং "উপন্যাস হিসেবে তার সার্থকতা সমাজ জীবনকে বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বিকশিত করে তোলায়।" (রণেশ, ২০১২ : ২২০)

মার্কসবাদের প্রবর্তকেরা তত্ত্বকে জীবন থেকেই উদ্ভূত ও জীবনের সহযোগী বলে মনে করতেন, মানবজীবনের রহস্যময়তা ও বৈচিত্র্যকে তাঁরা চূড়ান্ত মূল্য দিতেন – রণেশ দাশগুপ্ত এ কথা সমালোচনায় উল্লেখ করে সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে সাহিত্যের বিচারও করেছেন। 'মার্কোয়েজের অন্যান্য উপন্যাস : একশ বছরের নিঃসঙ্গতা নিয়ে কিছু কথা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

> মার্কসবাদের স্রষ্টা কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রসারমান ও বিচিত্র লোকজীবনে এর সারসূত্রের পাশাপাশি এর বৈচিত্র্যকেও উপস্থাপিত করেছিলেন। ... আসল কথা এই যে, মার্কস জীবনের বৈচিত্র্যকে বড় করে দেখেছিলেন। (রণেশ, ২০১৪ : ৩০৯)

শিল্প-সাহিত্যে জীবনের এই বৈচিত্র্যকেই অনুসন্ধান করেছেন রণেশ দাশগুপ্ত। তাঁর চিন্তায় প্রতিফলিত হয়েছে দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদী ও দার্শনিকতাসমৃদ্ধ সৌন্দর্যবাদী – এই উভয় মতের সংমিশ্রিত রূপায়ণ। কখনও কখনও তাঁর সাহিত্য বিচার সৃজনশীল হয়ে ওঠে এ কারণে। তাঁর রাজনীতির বোধ আর সাহিত্যচিন্তা অবিচ্ছিন্ন থাকেনি, এক হয়ে মিশে গেছে একে অপরের সাথে। তাঁর সমালোচনাকর্ম বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, এক উচ্চতর মানবতাবাদী দর্শনে আস্থা রেখে ও জীবনের জন্যই সাহিত্য এ কথা বিশ্বাস করে সমালোচনা করেছেন তিনি। তাছাড়া কেবল তত্ত্বের আলোকে সাহিত্য-বিচার করলে তা খণ্ডিত হয়ে যেতে পারে। যেমন 'মার্কসীয় বাতাবরণ : শতাব্দীকালের সাহিত্যে' প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়ে রণেশ লিখ্‌ছেন :

> বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অথবা *অপরাজিত* উপন্যাসকে মার্কসবাদী বলাটাও খণ্ডিত বিচার হয়ে যাবে।
>
> এইভাবেই *পথের দাবী* ও *রক্তকরবীকে* দিয়ে শরৎচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন অন্যান্য সাহিত্যকৃতিকে ছাপিয়ে গেলে সেটাও খণ্ডিত বিচার হবে। এমন কি কাজী নজরুল ইসলামকে পুরোদস্তুর মার্কসবাদী বলে দাবী করলে মার্কসীয় তত্ত্বের যে একটা অবিভাজ্য দিক আছে তাকে লঙ্ঘন করা হবে। (রণেশ, ২০১২ : ৩৯৩)

সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদকে সাহিত্য বিবেচনায় এনেছেন রণেশ দাশগুপ্ত; কারণ তিনি জানেন শ্রেণিবিভক্ত সমাজে সাহিত্যের সংজ্ঞাও শ্রেণি-আওতামুক্ত হতে পারে না এবং শ্রেণির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই সাহিত্যের জন্ম। আর শোষণমুক্তিই পারে সাহিত্য শিল্পকলার বিকাশ ঘটাতে। সাহিত্যবিচারে এ পর্যায়ে মুক্ত চিন্তার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকা প্রভৃতি মহাদেশের বহু শিল্পী-সাহিত্যিকের রচনা থেকে মার্কসীয় তত্ত্ব ও সৌন্দর্য আবিষ্কার করেছেন। দেশী লেখকদের সাহিত্যকর্ম থেকেও শ্রমজীবী মানুষের জীবনসংগ্রাম তথা শ্রেণিসংগ্রাম, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের চিত্র তুলে ধরেছেন সমালোচক। কেবল মার্কসীয় চেতনা শনাক্ত করা বা প্রত্যক্ষ করাই নয় বরং বাস্তব জীবনের এক চরম সত্যকে উদ্‌ঘাটন করতেই যেন সাহিত্য বিচার করেছেন তিনি। 'মার্কসীয় বাতাবরণ : শতাব্দীকালের সাহিত্যে' নামক প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টির ধারায়... শিল্পীদের সাধনার ধারাটিও বিবেচনার দাবিদার। এঁরা সকলেই জীবনশিল্পী হিসেবে জীবনসত্যকে সমস্ত অন্তর ঢেলে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মন ছিল খোলা। শুধু বাস্তবের জন্যে নয়, সম্ভাবনার জন্যেও। আমাদের উপমহাদেশের মুক্তিসংগ্রামের গণঅভ্যুত্থানের কর্মসূচীতে বিশের দশকে যুক্ত হয়েছিল শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লব। এর যতটা ছিল বাস্তব, তার চেয়ে বেশি ছিল সম্ভাবনা। আমাদের সাহিত্যের জীবনশিল্পীরা বাস্তবের পাশাপাশি এই সম্ভাবনাকে বড় করে দেখিয়েছেন। (রণেশ, ২০১২ : ৩৯৩)

রণেশ দাশগুপ্তের ভাষা ভাবনাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। 'মাতৃভাষা তথা লোকভাষা তথা গণভাষাকে রণেশ দাশগুপ্ত কবিতার প্রাণ হিসেবে মনে করতেন।' (সৌমিত্র, ২০১২ : বিশ) মানবজীবনের গতিময়তার সঙ্গে কাব্যসাহিত্যের অব্যাহত ধারাকে গুরুত্ব দিয়েছেন সমালোচক। আর তা মাতৃভাষার সঙ্গেও জড়িত। 'কবিতা ভাষা মাতৃভাষা' প্রবন্ধে রণেশ লিখেছেন :

> কবিতা ও মাতৃভাষাকে একত্রীভূত করে দেখার যে তাগিদ সেটি হচ্ছে মানব সমাজের মুক্তি সংগ্রামের অদম্য বিকাশের তাগিদ। মাতৃভাষা কবিতার সত্যের ব্যাপ্তি এবং গভীরতারই উপাদান, জনগণের সচলতা এবং বিপ্লবী পদক্ষেপের প্রাণশক্তি"। (রণেশ, ২০১৪ : ২৩৯)

শিল্পকে সমাজ-চৈতন্যের অন্যতম রূপ হিসেবে গণ্য করেই রণেশ দাশগুপ্ত আদ্যন্ত সাহিত্য বিচার করেছেন। মার্কসীয় বীক্ষাশাস্ত্রের পর্যালোচনা করে সমালোচনায় বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন তিনি। একই সাথে সাহিত্য 'সাহিত্যকর্ম'

হিসেবে কতটা সার্থক হয়েছে – সাহিত্যবিচারক হিসেবে তা আস্বাদন বা উপভোগের সংস্কারও তার ছিল। তাঁর আজীবনের রাজনীতি-সাধনা, রাজনীতি-বোধ বা গভীর সচেতনতা সাহিত্যকে তাঁর জীবন থেকে কখনও বিযুক্ত করেনি। কোনো শিল্পে সমাজ বিষয়ে লেখকের দৃষ্টিক্ষীণতা ও শৈল্পিক দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলো কোথাও কোথাও চিহ্নিত করলেও শুধুমাত্র রাজনীতির প্রশ্নে কোনো রচনাকে নিম্নশ্রেণির বলে গণ্য করেননি তিনি।

মার্কসবাদী বিচার শিল্প-সাহিত্যের স্বতন্ত্র ও স্বকীয় রূপ-রস-বিচারকে অগ্রাহ্য করে না। সমাজ-জীবনের বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে, সামাজিক শ্রেণিদ্বন্দ্বের সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের সূক্ষ্ম, জটিল এবং অনেক সময় আপাতবিরোধী বিপরীত সম্পর্ক নির্ণয়ও মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বের লক্ষ্য। সাহিত্য বিবেচনায় সমাজমানসের ও ব্যক্তিমানসের স্তর পর্যায়ের রূপান্তর বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গটি কেবল অর্থনৈতিক শ্রেণিদ্বন্দ্বের মানদণ্ডে বিচার করলে সবসময় তা সঠিক হয় না। সমাজ-অর্থনীতি ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ (context) বা ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন সাহিত্য সৃজন হতে পারে না। তবে সাহিত্যের ব্যাখ্যায় সৌন্দর্যতত্ত্বের সহযোগী হিসেবে একাধারে রাজনৈতিক ব্যাখ্যাও ঠিক নয়; আবার সাহিত্যের সমস্ত অধ্যয়ন ও উপলব্ধির কেন্দ্রে রয়েছে পাঠের (text) রাজনৈতিক ব্যাখ্যা। সাহিত্যের আপেক্ষিক, উপযোগিতাবাদী তথা উপকরণ মূল্য ও চরম মূল্যের বিভাজনও মার্কসবাদী সাহিত্য বিচারে কাম্য নয়। সমাজ ও সাহিত্যের সম্পর্ক সাহিত্যের বিষয় এবং সংগঠন এই দুইয়েই প্রকাশিত হয়। যে সুনির্দিষ্ট সামাজিক মুহূর্তের মধ্যে সাহিত্যিক বা শৈল্পিক সৃষ্টির মূল নিহিত, সেই অবস্থার সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বোঝা যায় সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে; কারণ বিষয় ও আঙ্গিক মূলত অবিভাজ্য। মার্কসবাদী সাহিত্যবিচারের এই সূত্রগুলো রণেশ দাশগুপ্তের সমালোচনায় ক্রিয়াশীল হয়েছে বলেই মনে হয়। তাঁর সাহিত্য-বিবেচনাকে এ কারণে একই সাথে বৈজ্ঞানিক, যুক্তি-শৃঙ্খলাপূর্ণ ও শৈল্পিক কর্মকাণ্ড হিসেবে অভিহিত করা যায় অনায়াসে।

সাহিত্যকর্মের মাঝে অনুরূপতা ও আন্তঃসম্পর্ক পরিস্ফুট করতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা করে রণেশ তাঁর পঠন-পাঠনের গভীর বিস্তৃতি ও সেইসাথে উদার সাহিত্যনীতি এবং সমালোচনার পরিচয় দিয়েছেন।[১] শিল্প-সাহিত্য সম্পর্কিত সমস্যা বা জিজ্ঞাসাগুলো অনুসন্ধানের নিজস্ব একটা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাঁর। সর্বোপরি আধুনিক মার্কসবাদী সমালোচনার একটা পরাদর্শ (standard) নির্দিষ্ট করে দিয়ে বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে রণেশ দাশগুপ্ত অনন্য হয়ে আছেন।

টীকা

১ রণেশ দাশগুপ্তের প্রায় প্রতিটা সমালাচনাই তুলনামূলক আলোচনাসমৃদ্ধ। বিশেষত বিপ্লবী শ্রেণি-দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন যেসব সাহিত্যকর্ম 'সংগ্রামী সচলতায় পূর্ণ' বা 'জনগণাত্মক' সেই সব সাহিত্যিকের চিন্তার প্রতিতুলনা করেছেন তিনি। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, *উপন্যাসের শিল্পরূপ* গ্রন্থের 'চীনা উপন্যাস' প্রবন্ধে রণেশ চীনা ঔপন্যাসিক লু সুন ও লাও চাও (১৮৯৯-১৯৬৬)-এর সাথে রুশ ঔপন্যাসিক লিও টলস্টয়, ম্যাক্সিম গোর্কি, ইংরেজ লেখক সমারসেট মম্ (১৮৭৪-১৯৬৫), পার্ল বাক (১৮৯২-১৯৭৩) ও ফরাসি লেখক আঁদ্রে মারলোর তুলনা করেছেন। জাতীয় অভ্যুদয়মূলক উপন্যাসের গতিপ্রকৃতি তুলনায় এশিয়া, আফ্রিকা, এবং ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের উপন্যাসের সমালোচনা করেছেন তিনি। এছাড়া তুলনার ক্ষেত্র হিসেবে তিনি উপন্যাসের বিষয়বস্তু, শিল্পরূপ বা ফর্ম অর্থাৎ সাংগঠনিক নানা দিকও বেছে নিয়েছেন। যেমন– 'বাংলা উপন্যাসের অভ্যুত্থানমূলক ধারা'(*রণেশ দাশগুপ্ত রচনাসমগ্র* ১ অন্তর্ভুক্ত) প্রবন্ধে উপন্যাসে প্রতিফলিত বাস্তবতা, ভাবলৌকিকতা ও কল্পলোকমুখীনতা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের *আনন্দমঠ* ও রবীন্দ্রনাথের *গোরার* প্রতিতুলনা করা হয়েছে। এছাড়া 'রবীন্দ্রনাথ ও সাজ্জাদ জহীর' প্রবন্ধে উর্দু প্রগতিবাদী লেখক সাজ্জাদ জহীর ও রবীন্দ্রনাথের এবং 'জোশ মলিহাবাদী : দুজনের একজন' প্রবন্ধে উর্দু কবি শব্বীর হোসেনের সাথে নজরুলের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন তিনি। এই ব্যতিক্রমী অনুসন্ধানই সাহিত্য-সমালোচনায় রণেশের বিস্তৃত পাঠ-পরিচয় ও ঔদার্য প্রমাণ করে।

গ্রন্থপঞ্জি

আনিসুজ্জামান (২০০২)। 'রণেশ দাশগুপ্ত', *রণেশ দাশগুপ্ত স্মারকগ্রন্থ*। (সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত), আগামী প্রকাশনী, ঢাকা। পৃ. ৬৩-৬৬

দীপ্তি ত্রিপাঠী (১৯৫৮)। *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

বেগম আকতার কামাল (২০০২)। '*উপন্যাসের শিল্পরূপ* : একটি সমীক্ষণ', *রণেশ দাশগুপ্ত স্মারকগ্রন্থ*। প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৭-২৫০

রণেশ দাশগুপ্ত (২০১২)। *রণেশ দাশগুপ্ত রচনাসমগ্র*। (সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত), ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

রণেশ দাশগুপ্ত (২০১৪)। *রণেশ দাশগুপ্ত রচনাসমগ্র*। (সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত), ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ [সম্পাদিত] (২০১৩)। *রণেশ দাশগুপ্ত শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (২০০২)। 'রণেশ দাশগুপ্ত : জীবনকথা' *রণেশ দাশগুপ্ত স্মারকগ্রন্থ*। প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-৬০

সৌমিত্র শেখর [সম্পাদিত] (২০১২)। *রণেশ দাশগুপ্ত রচনাসমগ্র* ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা। ভূমিকা পৃ. পাঁচ-পঁচিশ